STUDY MATERIALS

UG/SEMESTER : 2

DSC/GE-2 , CODE : BNGHGEC02T

UNIT : 2 (বাংলা ভাষার উপভাষা সংক্রান্ত আলোচনা)

(৯) একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ করে যৌগিক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন—রামচন্দ্র বনে গেলেন এবং পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন। এরকম সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ না করে পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করেও বাক্য দু'টিকে যোগ করে একটিমাত্র সরল বাক্য রচনা করা যায়। এটি আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। যেমন—রামচন্দ্র বনে গিয়ে পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন।

(১০) আধুনিক যুগে বাঙালীর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির —বিশেষত পাশ্চাত্ত্য ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির—যোগ স্থাপিত হয়। তার ফলে ভাষাঋণের বিভিন্ন সূত্র ধরে বাংলায় বিভিন্ন ভাষা থেকে উপাদান গৃহীত হয়। প্রধানত ইংরেজী ভাষা থেকে বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়। যেমন—চেয়ার (chair), টেবিল (table), রেডিও (radio) ইত্যাদি। কিছু-কিছু ইংরেজী শব্দ বাংলায় গৃহীত হবার পর বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের সঙ্গে মিলে এমন পরিবর্তিত হয়ে দেশীয় (naturalised) রূপ লাভ করেছে যে তাদের বিদেশী শব্দ বলে চেনাই যায় না। যেমন—lord > লাট্, chord > কার (লাল কার, কালো কার), lantern > লণ্ঠন ইত্যাদি। শব্দ ছাড়াও কিছু-কিছু বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন—university > বিশ্ববিদ্যালয়, wrist watch > হাতঘড়ি, He will place his opinion now > এবার তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন। ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা থেকেও বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—পর্তুগীজ :—আনারস, আলপিন, আলমারি ইত্যাদি ; ফরাসী :—কুপন, বুর্জোয়া ইত্যাদি ; ইতালীয় :—গেজেট ইত্যাদি ; জার্মান :—জার, নাৎসী ইত্যাদি ; রাশিয়ান :—সোভিয়েত ইত্যাদি ; হিন্দী :—লাগাতার বন্ধ, বাতাবরণ, জাঠা ইত্যাদি।

(১১) ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরানো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশ ছন্দের জন্ম তো হলই, আধুনিক কবিতায় গদ্যচ্ছন্দেরও সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় ইংরেজী ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।

॥ ৫০ ॥

উপভাষা
(Dialects)

ভাষার সংজ্ঞায় আমরা বলেছি, ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনি-সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে। যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা-সম্প্রদায় (Speech Community) বলেন : "A Group of people who use the same system of speech signals is a *speech community*."[৬৫] যেমন একটি ধ্বনিসমষ্টি ধরা যাক—'আমরা বই পড়ি'।

এখানে যে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেই ধ্বনিসমষ্টি এই নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙালীরাই ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তা শুধু বাঙালীরাই বুঝতে পারে। সুতরাং বাঙালীদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় (Speech Community) বলতে পারি। এই একই ভাব প্রকাশের জন্যে আবার অন্য ভাষা-সম্প্রদায় অন্য ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে।

এক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে তা হল—We read books. জার্মানরা এক্ষেত্রে বলবে—Wir lesen Bücher. ফরাসীরা বলবে—Nous lisons des livres. হিন্দী ভাষীরা বলবে—হম কিতাব পঢ়তে হৈঁ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। এক-এক ধরনের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ-বিধিতে এক-একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত। অর্থাৎ এক-একটি ভাষা এক-একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হল এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায়। কিন্তু এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন, পূর্ব বাংলা ('বাংলা দেশ') এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি

৬৫। Bloomfield, Leonard : *Language*. Delhi : Motilal Banarsidass, 1963, p. 29.

পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language."[৬৬] অর্থাৎ উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশী না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা হয়ে উঠে। এই সংজ্ঞায় উপভাষার পরিচয় মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় বটে, কিন্তু ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয় না। কারণ ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক; শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক্ রূপকে উপভাষা বলে। কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে চরমে গেলেই আবার একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক রূপগুলি তখন একই ভাষার উপভাষা নয়, তখন সেগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষা। যেমন বাংলা ও অসমিয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দু'টি উপভাষা ছিল, পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও আসামের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য যখন বেড়ে গেল তখন বাংলা ও আসামের আঞ্চলিক রূপ দু'টিকে পৃথক্ ভাষারূপে চিহ্নিত করা হল—বাংলা ভাষা ও অসমিয়া ভাষা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপের পার্থক্যকে কোন্ স্তর পর্যন্ত উপভাষা বলা হবে, এবং এই পার্থক্য বাড়তে-বাড়তে কোন্ স্তরে এলে সেগুলিকে আর উপভাষা বলা যাবে না, সেগুলি হয়ে উঠবে স্বতন্ত্র ভাষা? বস্তুত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

৬৬। Pei, Merio A. and Gaynor, Frank: *A Dictionary of Linguistics*, London: Peter Owen, 1970, p. 56.

কেউ-কেউ বলেছেন, ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। যেমন—বাংলা ও আসামের ভাষা। কিন্তু এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবাংলা (ভারত)-এর উপভাষাকে দু'টি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। অথচ পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার ভাষাকে তো আমরা স্বতন্ত্র ভাষা বলি না, একই ভাষার দু'টি উপভাষা বলি। তাহলে বলতে হবে, দু'টি জনগোষ্ঠী যখন সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক্ হবে তখন তাদের আঞ্চলিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে। যেমন আসাম ও বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক্, কিন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক্ নয়, তাদের একই সংস্কৃতি—বাঙালীর সংস্কৃতি। এখানে মনে রাখতে হবে আবার সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ব্যাপারটিও অনেকটাই আপেক্ষিক; কারণ বাংলা ও আসামের সংস্কৃতির মধ্যেও কিছুটা ঐক্যসূত্র আছে, অন্যদিকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিতেও কিছুটা পার্থক্য আছে। আবার ভাষাও তো সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই ভালো যে, ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত কিছু নয়, আপেক্ষিক মাত্র। এই আপেক্ষিকতার কথা মনে রেখেও কেউ-কেউ বলেছেন, একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility) থাকে ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা (dialect)। যখন এই আঞ্চলিক রূপগুলি পৃথক্ হতে-হতে পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তাদের স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায়। কিন্তু এই মানদণ্ডও সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বাংলা ভাষারই দু'টি উপভাষা রাঢ়ী ও চট্টগ্রামীর মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। চট্টগ্রামের বাঙালী দ্রুত কথা বলে গেলে পশ্চিমবাংলার বাঙালী কিছুই বুঝতে পারবে না; তার চেয়ে সে বরং বুঝতে পারবে অসমিয়া ভাষায় রেডিও সংবাদ। আদর্শ বাংলা ও আদর্শ অসমিয়ার (Standard Assamese) মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা বরং বেশী। তবু অসমিয়া ও বাংলা দু'টি পৃথক্ ভাষা, কিন্তু বাংলা ও চট্টগ্রামী একই ভাষার দু'টি উপভাষা। আরো মনে রাখতে হবে যে, এই পার্থক্যও মোটামুটি ধরনের পার্থক্যই। কারণ বোধগম্যতার তারতম্য হয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে, আর বোধগম্যতা ব্যাপারটিও অনেকক্ষেত্রে subjective। সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, উপভাষা অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত। ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শ (standard) রূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের-নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় (informal discourse) আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে, বক্তৃতায়, বেতার-সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে। এরকম ভাবে প্রায়ই দেখা যায় একটি আদর্শ ভাষার (Standard Language) এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়। আধুনিক কালে শিষ্ট সাহিত্যে যে বেশী করে উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়, সেটা বস্তুত আঞ্চলিক লোকজীবনকে জীবন্তভাবে তুলে ধরার জন্যেই। উপভাষাগুলিতে সাধারণত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিশেষ রচিত হয় না, তেমনি এগুলির কোনো ব্যাকরণও সাধারণত লিখিত হয় না। সম্প্রতি উপভাষা সমীক্ষা ও উপভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কোনো উপভাষায় স্বতন্ত্র সাহিত্য চর্চা ও তার ব্যাকরণ রচনার সচেতন প্রয়াস যখন সংঘটিত হয় তখন তা ক্রমে ভাষার মর্যাদা লাভ করতে থাকে। এই প্রচেষ্টা ভারতে ভোজপুরী ও অন্যান্য কোনো-কোনো ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে ক্রমে তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলে তা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

অঞ্চলভেদে যেমন একই ভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্য হয়, তেমনি সামাজিক স্তরভেদেও একই ভাষাভাষী লোকেদের কথায় অল্পবিস্তর পার্থক্য হতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, একজন অধ্যাপক, একজন উকিল, একজন রাজনৈতিক নেতা, একজন শ্রমজীবী এবং একজন দাগী অপরাধী গুণ্ডার ভাষার উচ্চারণে ও শব্দ ব্যবহারে বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। একই ভাষার মধ্যে সামাজিক স্তরভেদে এই যে পার্থক্য একে সামাজিক উপভাষা (Social dialect) বলতে পারি। আবার সমাজে ইতরজনের, মস্তানদের অপরাধ-জগতের মানুষের ভাষাও অনেকটা আলাদা। সমাজের ইতরশ্রেণী ও অপরাধীদের মধ্যে গোপন সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতপূর্ণ যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাকে **অপার্থ ভাষা (Cant)** বা **সঙ্কেতভাষা (Code Language)** বলে। যেমন—

"গণেশ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'পটাশদার কোনো দোষ নেই। যত দোষ ওই বদে শালার। ও-ই পটাশদাকে ডেকে অপমান করেছে। বাপ তুলে খিস্তি দিয়েছে। আমি শুনেছি। পটাশদা তাই মাঝরাতে বড়খোকা ঝেড়ে দিয়েছে দু'খানা—

'বড়খোকা কি ?'

'জানেন না ? ছুছোও ! এই যে সাইজ—' ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মুদ্রায় একটা গোলাকার বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তুলল গণেশ।" (—ডঃ তপোবিজয় ঘোষ : 'কাল-চেতনার গল্প', ১ম খণ্ড, একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা)।

—এখানে 'বোমা' অর্থে 'বড় খোকা' কোনো-কোনো জায়গার অপরাধ-জগতের সঙ্কেতপূর্ণ ভাষার নিদর্শন।

এরকমের গোপনে ব্যবহারের প্রয়োজনে সৃষ্ট সঙ্কেত-শব্দ বা সঙ্কেত-ভাষা ছাড়াও ইতর বা অভদ্র জনের মধ্যে এমন কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রচলিত থাকে যার ব্যবহার সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়। একে **ইতর শব্দ (Slang)** বলে। যেমন—মাল খাওয়া (মদ্য পান করা), বাঁশ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করা), ল্যাঙ্ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা), চামচে (পরের তোষামোদকারী বা অনুগামী), বডি ফেলা (ঘুমানো বা শুয়ে পড়া) আলুর দোষ (অবৈধ প্রণয়ের দিকে ঝোঁক) ইত্যাদি। ইতর শব্দ কিছুদিন ব্যবহারের পর ক্রমশ ভদ্রসমাজেও স্থান পায়, তখন আর তা ইতর শব্দ থাকে না। যেমন—হাতানো (আত্মসাৎ করা) ইত্যাদি।

ভদ্র-ইতর নির্বিশেষে সর্বসাধারণের দ্রুত উচ্চারণ ও ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় কোনো বড় শব্দের অংশবিশেষ কেটে বাদ দিয়ে শুধু তার একটা অংশকেই গোটা শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়। একে **খণ্ডিত শব্দ (Clipped Word)** বলে। এমন প্রয়োগ চলিত ভাষাতেই বেশী হয়ে থাকে। যেমন—মিনি (Minimum), ম্যাক্সি (Maximum), এন্থু (Enthusiasm), কং-ই (কংগ্রেস-ই), মাইক (মাইক্রোফোন), ফোন (টেলিফোন), কংগ্রাট্ (Congratulation) ভেজ্ (Vegetarian) ইত্যাদি।

এরকম দ্রুত ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় আবার একাধিক শব্দে গঠিত একটি নামকে বা পদগুচ্ছকে এমন ভাবে ছোট করা হয় যে তাতে শুধু একটিমাত্র শব্দের অংশবিশেষ নেওয়া হয় না, একাধিক শব্দের প্রথম বর্ণ বা অক্ষরটি নিয়ে সেগুলি যোগ করে একটি শব্দই গড়ে তোলা হয়। একে **মুণ্ডমাল শব্দ (Acrostic Word)** বলে। যেমন—ওয়াব্কুটা=WBCUTA (West Bengal College and University Teachers' Association), ইউনেস্কো=Unesco (United Nations Education Scientific and Cultural Organisations), নেফা=Nefa (North-Eastern Frontier Area), তদেব (তৎ+এব=ibid. <ibidem), দপ্ডে (দরকার পড়লে

ডেকো), সি পি এম=CPM (Communist Party Marxist) ইত্যাদি। এরকমের প্রয়োগ সাধু ও চলিত ভাষা এবং উপভাষা সর্বক্ষেত্রেই চলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার নানান্তর, নানা পার্থক্য থাকে—ভাষার রূপ জটিল ও বিচিত্র। একটি সমাজে ভাষার এইসব জটিল রূপকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম্‌ফিল্ড্—

(১) আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (literary standard), (২) আদর্শ চলিত ভাষা (colloquial standard), (৩) প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা (provincial standard), (৪) ইতরজনের ভাষা (sub-standard), (৫) আঞ্চলিক উপভাষা (local dialect)।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ব্লুম্‌ফিল্ডের এই শ্রেণীবিভাগ পুরোপুরি গ্রহণীয় নয় এবং সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন—বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আদর্শ চলিত ভাষা ও প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা—এরকম দু'টি শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতা নেই।

যাই হোক, ভাষার যে এত বিচিত্র রূপ ও স্তরভেদ তার সবগুলি সম্পর্কে সমান গবেষণা হয়নি। সামাজিক উপভাষা সম্পর্কে গবেষণা আধুনিক কালে কিছু-কিছু হয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়; তা এখনো বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আঞ্চলিক উপভাষার দিকেই ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হয়েছে এবং প্রায় সব দেশের আঞ্চলিক উপভাষার একটা মোটামুটি চিত্র এখন রচিত হয়েছে।

অঞ্চলভেদে একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। হোমরের মহাকাব্যেও Ionic ও Aeolic উপভাষার পরিচয় রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। তখনকার তিনটি প্রধান উপভাষা ছিল: উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'উদীচ্য', মধ্য ভারতে (আধুনিক দিল্লী-মীরাট অঞ্চল) 'মধ্যদেশীয়' এবং পূর্বভারতে 'প্রাচ্য'। সম্ভবত আরো একটি উপভাষা ছিল—'দাক্ষিণাত্য'।[৬৭] মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও প্রথমে চারিটি প্রধান উপভাষা ছিল—উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা

৬৭। Chatterji, Dr. Suniti Kumar: *Indo-Aryan and Hindi*, Calcutta: Firm K. L. Mukhopadhyay, 1969, p. 60.

এবং প্রাচ্যা। পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক রূপভেদ কম নয়। পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ইংরেজীর দুই প্রধান রূপ—ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্রিটিশ ইংরেজীও সর্বত্র একরকম নয়—তাতেও উত্তর ও দক্ষিণের দুই প্রধান উপভাষাগত রূপ—Northern English ও Southern English। জার্মান ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য আরো বেশী। জার্মানভাষার উপভাষাগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে এগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য মাত্র তিনটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা হয়—উচ্চ-জার্মান গুচ্ছ, (Upper German Group), পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছ (West Middle German Group), পূর্ব-মধ্য জার্মানগুচ্ছ (East Middle German Group)। এই প্রত্যেক গুচ্ছে রয়েছে একাধিক উপভাষা। দক্ষিণ জার্মানীর দু'টি উপভাষা Alemanic (Alemanisch) ও Bavarian (Bairisch) নিয়ে উচ্চ জার্মান গুচ্ছ রচিত। Alemanic-এর দু'টি ভাগ—High Alemanic ও Low Alemanic। আবার High Alemanic উপভাষারই তিন অঞ্চলে তিন নাম: সুইজারল্যাণ্ডে Schwyzertütsch, জুরিখে Züritüütsch আর বের্ণে Bärndütsch। পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছেও অনেকগুলি উপভাষা; একে High Franconian গুচ্ছও বলা হয়। প্রথমত এর দু'টি উপবিভাগ—Upper Franconian ও Middle Franconian। এদের আবার নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক নাম। জার্মান ভাষার সর্বপ্রধান উপভাষাগুচ্ছ—উত্তর জার্মানীর East Middle German Group। এই গুচ্ছেও অনেকগুলি উপভাষা রয়েছে। ক্লপস্টক, লেসিং, হের্ডার, গ্যেটে, শীলার প্রভৃতির সাহিত্যসৃষ্টি এই উপভাষারই মূল কাঠামোকে অবলম্বন করে রচিত। এই উপভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্গত হ্যানোভার-কেন্দ্রিক ভাষা হল আধুনিক আদর্শ জার্মান (Standard German) ভাষার মূল ভিত্তি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষায়ই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য—আঞ্চলিক উপভাষা। বাংলাভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষারও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে। বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষা ও সেগুলির অবস্থান মোটামুটি এই রকম:—

উপভাষা	অবস্থান
রাঢ়ী	মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী—বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম)।
বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।
ঝাড়খণ্ডী	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর)।
কামরূপী বা রাজবংশী,	উত্তর-পূর্ব বঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।

চিত্র নং ৫৭ঃ বাংলা উপভাষার অবস্থান

এক-একটি উপভাষার অভ্যন্তরেও আবার নানা আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। এই রকম এক-একটি উপভাষার (dialect) মধ্যেও যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা (sub-dialect) বলে। বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর বিস্তার খুব বেশী। এই জন্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালী দুইয়ের অভ্যন্তরে একাধিক বিভাষা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের প্রধান উপভাষা (dialect) রাঢ়ী। যদিও মোটামুটিভাবে রাঢ়ীর দু'টি প্রধান বিভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম, তবু সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ ৪টি। এগুলি হল ঃ (ক) পূর্ব-মধ্য (east central) ঃ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া। (খ) পশ্চিম-মধ্য (west entral) ঃ পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া। (গ) উত্তর-মধ্য (north central) ঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ-মালদহ। (ঘ) দক্ষিণ-মধ্য উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (ডায়মণ্ড হারবার)।—

পূর্বে বঙ্গালীর দু'টি বিভাষা ছিল—(ক) বিশুদ্ধ বঙ্গালী (ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর এবং (খ) চাটিগ্রামী (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী)। এখন এই দু'টি বিভাষার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে চট্টগ্রামের উপভাষা ঢাকার লোকে প্রায় বুঝতেই পারে না। এখন এ দু'টিকে স্বতন্ত্র উপভাষা ধরাই ভাল।

বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির প্রত্যেকটির কিছু-কিছু নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে. এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যেই একটি উপভাষা অন্য উপভাষা থেকে পৃথক্ হয়ে উঠেছে। যেমন—

রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য ঃ—

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (phonological featnres) ঃ—

(ক) ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ হয় 'ও'। যেমন—অতি>[ওতি], মধু>[মোধু], লক্ষ>[লোক্ খো], সত্য> [শোত্তো]। অন্য ক্ষেত্রেও অকারের ওকার-প্রবণতা দেখা যায় যেমন—মন>[মোন], বন >[বোন]। কিন্তু অকারের এই ওকার প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না ; যেমন 'দল'-এর উচ্চারণ [দোল] হয় না।

(খ) পূর্ববাংলার বঙ্গালী উপভাষায় শব্দের মধ্যে অবস্থিত 'ই' এবং 'উ' সরে এসে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয়। যেমন—করিয়া> কইর‍্যা (অর্থাৎ ক্+অ+র্+ই+য়্+আ >ক্+অ+ই+র্+য়্+আ)। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী উপভাষায় এর পরবর্তী ধাপের ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে অপিনিহিতির ফলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে-আসা এই 'ই' ও 'উ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় এবং তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেও পরিবর্তিত করে ফেলে। যেমন—কইর‍্যা > করে (ক্+অ+ই+র্+য়+আ >ক্+অ+র্+এ) (এখানে 'ই' পূর্ববর্তী স্বর 'অ'-এর সঙ্গে মিশে গেছে এবং পরবর্তী স্বর 'আ' তার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'এ' হয়ে গেছে)। একে অভিশ্রুতি বলে। এই অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(গ) রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দেশি>দিশি (দ্+এ+শ্+ই>দ্+ই+শ্+ই) ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটেছে। যেমন—বন্ধ>বাঁধ, চন্দ্র>চাঁদ (এসব ক্ষেত্রে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্' লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বর 'অ'

দীর্ঘ হয়ে 'আ' হয়েছে এবং অনুনাসিক হয়ে 'আঁ' হয়েছে)। কোথাও-কোথাও নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও স্বরধ্বনির স্বতোনাসিক্যীভবন দেখা যায়। যেমন—পুস্তক>পুথি> পুঁথি। এখানে পুস্তক শব্দে কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন নেই ; তা সত্ত্বে 'উ' স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয়ে 'উঁ' উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ) উচ্চারিত হয়। যেমন—দুধ>দুদ্, মাছ>মাচ্, বাঘ্>বাগ্ ইত্যাদি।

(চ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ ইত্যাদি) কখনো-কখনো সঘোষ ধ্বনি (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ইত্যাদি) হয়ে যায়। যেমন—ছত্র>ছাত>ছাদ, কাক>কাগ। ব্যতিক্রম—রাত্রি>রাত। অন্যদিকে শব্দের অন্তে অবস্থিত সঘোষ ধ্বনি কখনো-কখনো অঘোষ হয়ে যায়। যেমন—ফারসী গুলাব>গোলাপ, ইত্যাদি।

(ছ) 'ল্' কোথাও-কোথাও 'ন্'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—লবণ > নুন, লুচি > নুচি, লোহ > নোয়া।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে -'দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন ঃ—কর্মকারক—আমাদের বই দাও। করণকারক—তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

(খ) সাধারণত সকর্মক ক্রিয়ার দু'টি কর্ম থাকে—মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়ার প্রসঙ্গে 'কি ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম আর 'কাকে'?—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম। রাঢ়ীতে গৌণ কর্মের বিভক্তি হচ্ছে '-কে' এবং মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। যেমন—আমি রামকে (গৌণকর্ম) টাকা (মুখ্য কর্ম) ধার দিয়েছি। রাঢ়ীতে সম্প্রদান কারকেও '-কে' বিভক্তির ব্যবহার করা হয়। যেমন—দরিদ্রকে অর্থদান করো।

(গ) অধিকরণ কারকে '-এ' এবং '-তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে। গজদন্ত-মিনারে বসে জনতার প্রতি প্রেমের বাণী প্রচার করা ঠিক নয়, বিবেকানন্দের মতো সারা দেশ পায়ে হেঁটে দেখতে হবে।

(ঘ) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-ল'। (যেমন—সে গেল=He went) ; কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লে'

(যেমন—সে বললে=He said)। সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লুম' (যেমন—আমি বললুম=I said)।

(ঙ) মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে সেই আছ্ ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন—কর্+ছি=করছি (আমি করছি), কর্+ছিল =করছিল (সে করছিল)।

(চ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপের সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে এবং সেই আছ্ ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন—করে+ছে=করেছে (সে করেছে), করে+ছিল=করেছিল (সে করেছিল)।

রাঢ়ী উপভাষার নিদর্শন ঃ

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা—"একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে ব'ল্লে—বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন্। তাতে তাদের বাপ তার বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন।"[৬৮]

(১) বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যঃ—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) শব্দমধ্যে অবস্থিত 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। বঙ্গালী উপভাষায় এই অপিনিহিতির ফলে সরে-আসা স্বরধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন—আজি > আইজ (আ+জ্+ই > আ+ই+জ্), করিয়া > কইর‍্যা ইত্যাদি। এছাড়া য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন, 'জ্ঞ' ও 'ক্ষ'-এর আগে একটি ইকারের আগম হয়। যেমন—বাক্য > বাইক্য, যজ্ঞ > যইগ্গ, রাক্ষস > রাইক্‌খস্ ইত্যাদি।

(খ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির (ঙ্, ন্, ম্ ইত্যাদির) লোপ হয় না, ফলে এই রকম লোপের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিকীভবনের প্রক্রিয়া

৬৮। Chatterji, Prof. Suniti Kumar : *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta : Prakash Bhavan, 1963, p. 73.

বঙ্গালীতে দেখা যায় না। যেমন—চন্দ্র > চান্দ (এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্' রক্ষিত আছে)।

(গ) উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' বঙ্গালীতে নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—দেশ > দ্যাশ্।

(ঘ) উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'ও' উচ্চারিত হয় উচ্চ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'উ'-রূপে। যেমন—লোক > লুক, সোদপুর > সুদপুর, দোষ > দুষ।

(ঙ) সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ (অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ ঘ্, ধ্, ভ্) বঙ্গালীতে সঘোষ অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ গ্, দ্, ব্) রূপে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া এগুলি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী দু'টি যুক্ত হয়ে স্বরপথ রুদ্ধ করে দেয় এবং বাইরের বায়ু আকর্ষণ করে উচ্চারণ করতে হয়। এই জন্যে এগুলি রুদ্ধস্বরপথ-চালিত অন্তর্মুখী (Glottalic Ingressive) ধ্বনি। এগুলিকে কেউ-কেউ অবরুদ্ধধ্বনি (Recursive) বলেছেন। উদাহরণ—ভাই > বা'ই, ভাত > বা'ত, ঘর > গ'র।

(চ) চ্, ছ্, জ্ প্রভৃতি ঘৃষ্টধ্বনি (affricate) বঙ্গালীতে প্রায় উষ্মধ্বনি (fricative/spirant) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—চ্ > ৎস্, ছ্ > স্, জ্ > জ্ [z]। খেয়েছে > খাইসে, জানতে পারো না > জান্তি [zanti] পারো না।

(ছ) 'স্' ও 'শ্'-স্থানে 'হ্' উচ্চারিত হয়। যেমন—শাক > হাগ, সে > হে, বসো > বহো।

(জ) শব্দের আদিতে ও মধ্যে 'হ্'-স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন—হয় > অ'য়।

(ঝ) তাড়িতধ্বনি 'ড়্' কম্পিতধ্বনি 'র্'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—বাড়ি > বারি।

রূপতত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারকে (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কর্তায়) '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—রামে খায়। মায়ে ডাকে।

(খ) সকর্মক ক্রিয়া প্রসঙ্গে '-কি ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে মুখ্য কর্ম বলে এবং 'কাকে ?—'এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে গৌণ কর্ম বলে। বঙ্গালীতে গৌণ কর্মে ও সম্প্রদান কারকে '-রে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—আমারে দাও। রামেরে কইস। গরীব মানুসেরে দু'টি পয়সা দাও।

(গ) অধিকরণ কারকের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—বাড়ীত থাকুম।

(ঘ) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহু বচনের বিভক্তি হল '-গো'। যেমন—আমাগো খাইতে দিবা না ?

(ঙ) ক্রিয়ারূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—রাঢ়ীতে যেটা সাধারণ বর্তমানের রূপ বঙ্গালীতে সেটা ঘটমান বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মায়ে ডাকে (অর্থাৎ মা ডাকছে)।

(চ) সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লাম'। যেমন—আমি খাইলাম।

(ছ) রাঢ়ীতে যেটা ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি বঙ্গালীতে সেটা পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি করসি (< করছি) (অর্থাৎ আমি করেছি)।

(জ) মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল '-বা'। যেমন—তুমি যাবা না ?

(ঝ) উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল '-উম্' ও '-মু'। যেমন—আমি যামু (অর্থাৎ আমি যাবো); আমি খেলুম না (অর্থাৎ আমি খেলব না)।

(ঞ) রাঢ়ীতে অতীত কালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় যেখানে 'নি', বঙ্গালীতে সেখানে 'নাই'। যেমন—তুমি যাও নাই ? (তুমি যাও নি ?)

(ট) অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন—রাম গ্যাসে গিয়া (= রাম চলে গেছে)।

বঙ্গালী উপভাষার নিদর্শন :

ঢাকা (মানিকগঞ্জ): "য়্যাক্ জনের্ দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটোডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার বাগে যে বিত্তি-ব্যাসাদ্ পরে, তা আমারে দ্যাও।" তাতে তিনি তান্ বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান্।"[৬১]

৬১। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Pt. 1, Delhi, Motilal Banarasidass, reprint 1968. p. 206.

বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দু'টি প্রথমে একটিই উপভাষা ছিল। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায়, উত্তরবঙ্গের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) বরেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীরই মতো। অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে।

(খ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি, অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন—ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—বাঘ্ > বাগ্)।

(গ) রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অতখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে জ্ [ʒ] প্রায়ই জ্ [z]-রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র্' থাকার কথা নয় সেখানে 'র্'-এর আগম হয় (যেমন—আম > রাম), আবার যেখানে 'র্' থাকার কথা সেখানে 'র্' লোপ পায় (যেমন রস > অস)। ফলে 'আমের রস' উত্তরবঙ্গের উচ্চারণে দাঁড়ায় 'রামের অস'।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো-কখনো '-ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—ঘরত (=ঘরে)।

(খ) সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—খেলাম।

বরেন্দ্রী উপভাষায় নিদর্শন ঃ

মালদহ ঃ "ম্যাক্ ঝোন্ মানুষের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপ্নার বাবাক্ কহ্লে, বাব ধন্-করির যে হিস্যা হামি

পামু, সে হামাক্ দে। তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলে।"[১০]

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বেশী, কারণ কামরূপী হল উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা এবং বরেন্দ্রী হল উত্তরবঙ্গের উপভাষা, সুতরাং দু'য়ের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য আছে। কিন্তু কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য খুবই কম, কারণ বরেন্দ্রী মূলত রাঢ়ীর একটি বিভাগ। বরং কামরূপীর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী বঙ্গালীর। কামরূপী হল কামরূপের (আসামের) নিকটবর্তী বঙ্গালীরই রূপান্তর।

(ক) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে (যেমন—ধরিল, ভরা), মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—সমঝা-সমঝি > সম্‌জা-সম্‌জি)।

(খ) বঙ্গালীর মতো কামরূপীতেও 'ড়্' হয়েছে 'র্' এবং 'ঢ়' হয়েছে 'র্হ্'। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কুচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিতই আছে। যেমন—বাড়ির।[১১]

(গ) চ্ জ্, স্ / শ্ [c ʒ ʃ/s] হয়েছে যথাক্রমে ৎস্, জ্, হ্ [ts z h], কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র দেখা যায় না। গোয়ালপাড়া-রংপুরের উচ্চারণে 'স্' রক্ষিত আছে। যেমন—সতেরো > সাতির, সমঝাবার > সমজেবার। দিনাজপুরে 'চ্' অপরিবর্তিত। যেমন—বাচ্চা।[১২]

(ঘ) রাঢ়ীতে যেমন সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্তেও পড়ে।

(ঙ) 'ও' কখনো-কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কোন্ > কুন্, তোমার > তুমার। তবে এই প্রবণতা সর্বত্র সুলভ নয়। যেমন—কোচবিহার, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে 'কোন' উচ্চারণই প্রচলিত।

১০। Grierson, George Abraham : *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I, Delhi, 1968, p. 130.

১১। দাশ, ডঃ নির্মল ঃ 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ', ১৯৮৪, পৃঃ ১৭।

১২। তদেব।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে '-নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সেবা কন্নু (সেবা করলাম), কহিল (বলল), ধরিল (ধরল)।

(খ) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল—'মুই', 'হাম'।

(গ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—পাছত, পাছৎ (পশ্চাতে)।

(ঘ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হল—'-র', 'ক'। যেমন—বাপোক (বাপের), ছাগলের।

(ঙ) গৌণ কর্মের বিভক্তি হল '-ক'। যেমন—বাপক্ (=বাপকে), হামাক্ (আমাকে)।

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার নিদর্শন ঃ

কোচবিহার—"এক জনা মানসির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।" তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।"[৭৩]

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ[৭৪]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—চাঁ, হুইঁছে, উঁট, আঁটা।

(খ) 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতাও ব্যাপক। যেমন—লোক>লক, চোর>চর।

(গ) অপিনিহিত ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে যায়, তার লোপ বা অভিশ্রুতিজনিত পরিবর্তন হয় না। যেমন—সন্ধ্যা>সাঁইঝ>সাঁইঝ, কাল্লি>কাইল>কাইল, রাতি>রাইত>রাইত।

৭৩। Grierson, George Abraham: *Linguistic Survey of India*, Vol. V. Part I, Delhi. 1968, p. 188.

৭৪। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। দ্রষ্টব্য ঃ (ক) 'ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা' (১৯৭১) এবং 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা' (১৯৮৩)।

(ঘ) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—দূর>ধূর, পতাকা>ফত্‌কা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতে ছিল। এই রীতি অনুসারে বাংলাতেও নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত বিভক্তিকে যদি চতুর্থী বিভক্তি বলি তবে বলতে পারি এই বিভক্তি '-কে' ঝাড়খণ্ডীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বেলা যে পড়ে এল জলকে (জলের নিমিত্ত=জল আনতে) চল।

রাঢ়ীতে এসব ক্ষেত্রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না, অনুসর্গ (জন্যে, নিমিত্ত, হেতু) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(খ) নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর আরো একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—এবার শীতে ভারি জাড়াবে (নামধাতু 'জাড়')। 'হমর ঘরে চর সাঁদাইছিল' (সিঁধিয়েছিল)।

(গ) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন—যাবেক নাই?

(ঘ) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার কোথাও-কোথাও দেখা যায়। যেমন—করি বটে।

(ঙ) সম্বন্ধপদে ও অধিকরণে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—সম্বন্ধ ঃ—'ঘাটশিলা (ঘাটশিলার) শাড়ী কুনি (কুনির) মনে নাই লাগে।' অধিকরন ঃ—'রাইত (রাতে) ছিলি ঘাটশিলা টাঁইড়ে'।

(চ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল -নু, -লে, -রু। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)।

(ছ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-কে'। আইজ রাইতকে ভারি জাড়াবে।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—চুনটুকু কেনে নাই দিলি (চুনটুকু কেন দিলি না ?)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার নিদর্শন ঃ

মানভূম—"এক লোকের দুটা বেটা ছিল ; তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপ্‌কে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্যা আমি পাব তা আমাকে দাও।' এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্যা তাকে দিলেক।"[৭৫]

৭৫। Grierson, George Abraham: *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I, Delhi, 1968, p. 72.